

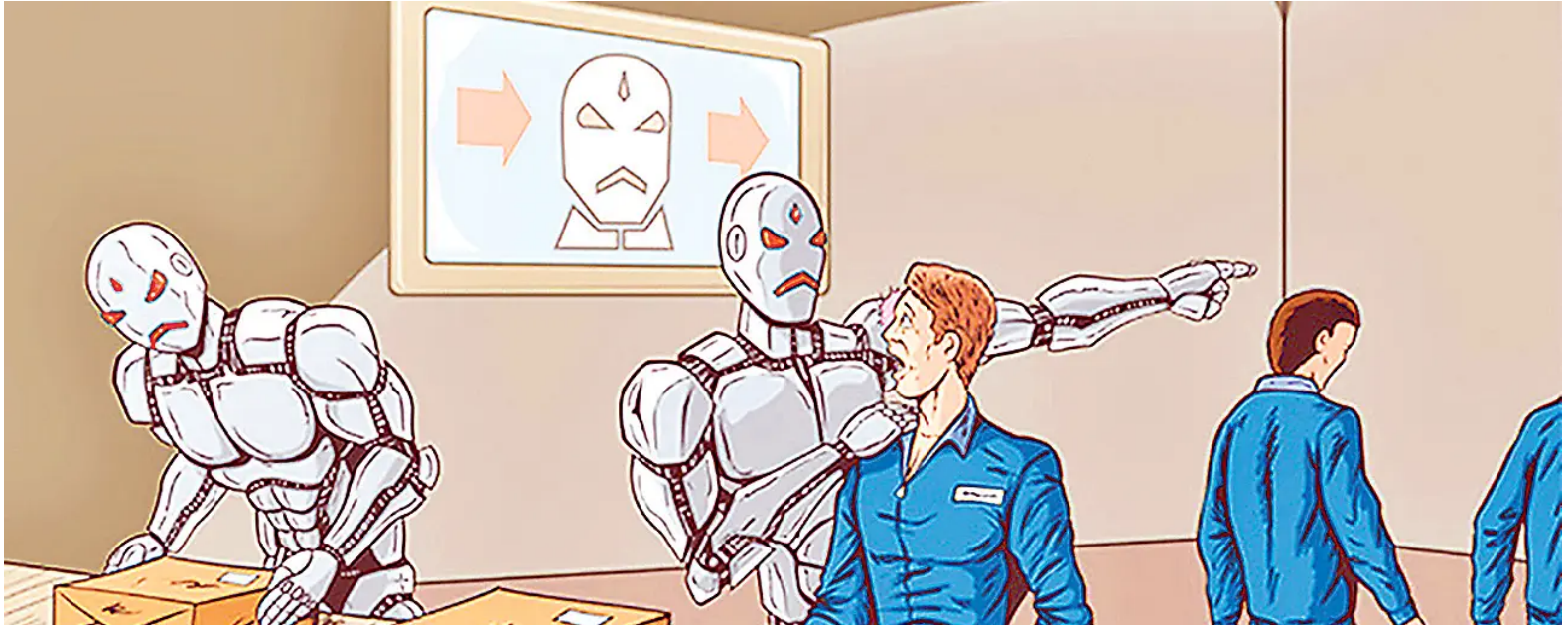
# প্রথম আলো

## কোন চাকরি থাকবে, কোনটি থাকবে না

বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিজিটাল থিংকিং বা সতর্ক চিন্তা ও বিশ্লেষণের। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৬০ শতাংশ কোম্পানি বলছে, এই দক্ষতার চাহিদা বাজারে দিন দিন বাড়ছে। এরপর সবচেয়ে বেশি চাহিদা সমস্যা সমাধানের দক্ষতার।



প্রতীক বর্ধন





মৌলিক শিক্ষা থাকলেই বাজারে চাহিদা থাকবে, এটা মনে করার অবকাশ আর নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে, বিশেষায়িত জ্ঞান থাকলে চাকরি পাওয়াও যেমন সুবিধাজনক, তেমনি মোটা মাইনে পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ফিউচার অব জব সার্ভে ২০২০-এ দেখা যাচ্ছে, বাজারে মৌলিক শিক্ষার চাহিদা স্থিতিশীল, চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষণ নেই।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এই জরিপে দেখা যায়, বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা সতর্ক চিন্তা ও বিশ্লেষণের। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৬০ শতাংশ কোম্পানি বলছে, এই দক্ষতার চাহিদা বাজারে দিনকে দিন বাড়ছে। এরপর সবচেয়ে বেশি চাহিদা সমস্যা সমাধানের দক্ষতার। এরপর যথাক্রমে আছে স্ব-ব্যবস্থাপনা, অন্যের সঙ্গে কাজের দক্ষতা, নানা ধরনের কাজের সমন্বয় ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নয়নের।

### আগামী পাঁচ বছরে যেসব দক্ষতার চাহিদা বাড়বে ও কমবে

ক্রম	চাহিদা বাড়বে	চাহিদা কমবে
১	তথ্য বিশ্লেষণ	ডেটা এন্ট্রি
২	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যন্ত্র শিক্ষণ	প্রশাসনিক ও নির্বাহী কাজ
৩	বিগ ডেটা স্পেশালিস্ট	হিসাবরক্ষণ ও পে রোলের করণিক
৪	ডিজিটাল মার্কেটিং ও কৌশল বিশেষজ্ঞ	নিরীক্ষা
৫	প্রক্রিয়া অটোমেশন	কারখানা শ্রমিকের কাজ

জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-এর ধাক্কায় অটোমেশন বা স্বতশলীকরণ ব্যাপক গতি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আগামী ৫ বছরে সারা পৃথিবীতে সাড়ে ৮ কোটি মানুষের চাকরি যাবে। জরিপে অংশ নেওয়া ৪৩ শতাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বলেছে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য তাদের কর্মী ছাঁটাই করা ছাড়া উপায় নেই। তবে যন্ত্রের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা বাড়াতেও হবে। আগামী পাঁচ বছরের সব কাজ মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে মোটামুটি সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে।

যন্ত্রের কারণে যেমন চাকরি যাবে, তেমনি নতুন অনেক চাকরি সৃষ্টিও হবে, ঠিক যেমন কম্পিউটার আসার পর হয়েছিল। জরিপের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনে নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম ব্যবস্থাপনা ও কনটেন্ট রচনায় নতুন নতুন ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া প্রকৌশল, ক্লাউড কম্পিউটিং ও পণ্য উন্নয়নে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। তবে প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত হলেও মানব যোগাযোগের গুরুত্ব বাড়বে। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে আসা মানুষের সঙ্গে কাজ করার সক্ষমতার চাহিদা তৈরি হবে।

বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে বিশ্লেষণী দক্ষতার চাহিদা বেড়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশেও টানা করে যেতে হয় এমন প্রকৃতির কাজের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে, অর্থাৎ যেসব কাজে বিশ্লেষণী দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না, সেই ধরনের কাজ। পাশাপাশি যারা রুটিন কাজ করেন, তাঁদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। পক্ষান্তরে, অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন কাজের মজুরি বেড়েছে। ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে দেশের ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ কর্মী এখনো মাঝারি দক্ষতার কাজে যুক্ত আছেন। আর উচ্চ দক্ষতার কাজে নিযুক্ত আছেন মাত্র ৮ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ।

নিয়োগকর্তা হিসেবে চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে কী দক্ষতা দেখতে চান, এমন প্রশ্নের জবাবে সহজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মালিহা কাদির প্রথম আলোকে বলেন, ‘সতর্ক চিন্তা ও বিশ্লেষণ—প্রথমেই আমি এই দক্ষতা চাইব। নতুন কিছু সহজে বুঝতে পারা এবং সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান বের করে আনার দক্ষতা থাকতে হবে। এ ছাড়া লেগে থেকে কাজটা করার মানসিকতা এবং সদর্থক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকা দরকার।’

এদিকে কোভিড-১৯-এর বিস্তার ঠেকাতে বাড়ি থেকে কাজের চল শুরু হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কর্মী ঘর থেকে কাজ করতে অক্ষম। বিশ্লেষকেরা বলছেন, পরিবর্তিত বাস্তবতায় কাজ করতে নতুন দক্ষতা রপ্ত করতে হবে। সব ধরনের কর্মীদের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য, বলছে ডব্লিউইএফ। সে জন্য কর্মীদের নতুন দক্ষতা শেখানোর বিকল্প নেই।

প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন দক্ষতার কর্মীদের গুরুত্ব কমে যায়। এতে উচ্চ দক্ষতার কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের বৈষম্য আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে নিম্ন দক্ষতার কর্মীদের নতুন দক্ষতা শেখানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষাও দিতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

---

জেনে নিন

## ব্যবসা শুরু করতে যা করতে হবে



প্র বাণিজ্য প্রতিবেদক

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করা সহজ নয়। বিশ্বব্যাংকের ব্যবসায় সহজ করার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পেছনের সারির দেশগুলোর একটি। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আগে দেখেন, এ দেশে ব্যবসা শুরু করতে কী ধরনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। তারপর তাঁরা বিনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। তবে বিশাল বাজারের সুবিধা নিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী বিদেশিরা। এবার দেখা যাক, এ দেশে ব্যবসা করতে হলে একজন বিদেশি বিনিয়োগকারীকে কী করতে হবে। ব্যবসা শুরুর আগে তাঁকে অন্তত পাঁচটি ধাপ পেরোতেই হবে।

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা, কর ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি বাংলাদেশ বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করার জন্য বিদেশিদের কিছু পরামর্শ দিয়েছে। এবার দেখা যাক, ব্যবসা শুরু করার সেই ধাপগুলো কী কী? বিদেশি বিনিয়োগকারীকে প্রথমেই বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কাছে বিনিয়োগ নিবন্ধন নিতে হবে। এর আগে বিডার ওয়েবসাইটে নির্দেশিকা দেখে নিলে কাজটি সহজ হয়। বিনিয়োগ নিবন্ধনের জন্য বিডার নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ফরমে আবেদন করে জমা দেওয়ার পর যাচাই-বাছাই শেষে আগ্রহী বিনিয়োগকারী নিবন্ধন পেয়ে যাবেন। বিডায় ওয়ানস্টপ সার্ভিস বা এক দরজায় সব সেবা দেওয়া হয়। এই সুবিধায় কাজ আরও সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ধাপে যেতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। সেখানে বিডার কাছে যে নিবন্ধন মিলেছে, সেটা জানানোই মূল উদ্দেশ্য। কারণ বৈদেশিক লেনদেনের সুবিধার জন্য এটি করতে হয়।

তৃতীয় ধাপে আসবে করের নিবন্ধন নেওয়া। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাধারণত দুই ধরনের নিবন্ধন দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একটি হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর, আরেকটি হলো ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন)। বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত কোম্পানি হিসেবে এ দেশে নিবন্ধিত হয়। পণ্য বা সেবা, এমনকি খাতের ব্যবসা হলে অবশ্যই ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর সার্কেল ও ভ্যাট কার্যালয়ে গিয়ে এসব সনদ নিতে হবে। কর কার্যালয়ের এসব কাজ করতে কয়েক দিন সময় লেগে যেতে পারে।

তৃতীয় ধাপে যেতে হবে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলোর নিবন্ধকের (আরজেএসসি) কার্যালয়ে। যে নামে কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সেটার অনাপত্তি নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কাক্ষিত নাম আরজেএসসির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে যাচাই করা যায়। আরজেএসসির নিবন্ধনের কাজ শেষ হয়ে গেলে শেষ ধাপে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। এগুলো সাধারণত সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হয়।

মনে রাখবেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগ করতে হলে সেখানে প্রথমে যেতে হবে। সেখানেও ওয়ানস্টপ সার্ভিস আছে।

এসব কাজ করতে কত দিন লাগে, এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তবে ২০২০ সালের বিশ্বব্যাপ্তির সহজে ব্যবসা করার সূচকে বলা হয়েছে, ব্যবসা শুরু করার কাজে এসব ধাপ সম্পন্ন করতে গড়ে ১৯ দিন সময় লাগে।

ব্যবসা শুরু করার সূচকে ১৯০টি, বাংলাদেশের অবস্থান ১৩১তম। তবে সার্বিকভাবে ব্যবসায় পরিবেশে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম।

## বিশ্ব অর্থনীতি

# অস্ত্র ব্যবসায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, এগোচ্ছে চীনারা



এ টি এম ইসহাক

কেউ দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে, কেউ অন্যকে বা অন্য দেশের ওপর প্রভাব খাটাতে কিংবা আক্রমণ করতে অস্ত্র কেনে। আবার কেউবা প্রতিবেশীর সঙ্গে ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে বা আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে অস্ত্রের মজুত গড়ে তোলে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক খাতগুলোকে উপেক্ষা করে দেশের স্বাভাবিক সামর্থ্যের তুলনায় বেশি খরচ করে অস্ত্রের জন্য। আবার বিভিন্ন দেশের কলহলিপ্ত বা স্বাধীনতাকামী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিগোষ্ঠীও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র সংগ্রহ করে। এসব মিলিয়ে বর্তমান বিশ্বে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দুভাবেই অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের কেনাবেচা দিন দিন বাড়ছে।

২০১৯ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ২৫টি কোম্পানি ৩৬১ বিলিয়ন বা ৩৬ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সেবা বিক্রি করেছে, যা বাংলাদেশের ৩০ লাখ ৬৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সমান। ২০১৯ সালের অস্ত্র বিক্রি ২০১৮ সালের চেয়ে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। সম্প্রতি সুইডেনের স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপ্রি) এ

তথ্য প্রকাশ করেছে। সিপ্রির আর্মস ইন্ডাস্ট্রি ডেটাবেইস অনুযায়ী ভৌগোলিকভাবে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অস্ত্র ও সামরিক সেবা বিক্রেতাদের উপস্থিতিতে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

## যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য

বৈশ্বিক অস্ত্রের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে। ২০১৯ সালে শীর্ষ পাঁচ অস্ত্র কোম্পানিই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কোম্পানিগুলো হচ্ছে লকহিড মার্টিন, বোয়িং, নর্থরোপ গ্রুম্যান, রেথিওন ও জেনারেল ডায়নামিকস। এই পাঁচ কোম্পানি গত বছর অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেছে ১৬৬ বিলিয়ন বা ১৬ হাজার ৬০০ ডলার। এই অর্থ শীর্ষ ২৫ কোম্পানির মোট অস্ত্র বিক্রির প্রায় ৪৬ শতাংশ। শীর্ষ ২৫ কোম্পানির মধ্যে ১২টিই যুক্তরাষ্ট্রের। শীর্ষ পাঁচিশের মোট অস্ত্র বিক্রির ৬১ শতাংশই হলো যুক্তরাষ্ট্রের এই ১২ কোম্পানির।

## দুই নবাগতের উত্থান

এই প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের একটি কোম্পানি শীর্ষ পাঁচিশে ঢুকেছে। সেটি হলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) এজ (ইডিজিই)। এটি আছে ২২তম স্থানে। ২৫টি ছোট ছোট কোম্পানির একীভূত হওয়ার সুবাদে গত বছরই যাত্রাও শুরু হয় এজের।

শীর্ষ পাঁচিশে আরেক নবাগত কোম্পানি হলো এলথ্রিহ্যারিস টেকনোলজিস। সেটি দশম স্থানে রয়েছে। দুটি মার্কিন কোম্পানি হ্যারিস করপোরেশন ও এলথ্রি একীভূত হয়ে এ কোম্পানি গঠন করে।

## চীনারা এগোচ্ছে, রুশরা পেছাচ্ছে

সিপ্রির এ তালিকায় চীনা কোম্পানি চারটি। তাদের বিক্রি বেড়েছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এর মধ্যে তিনটিই রয়েছে টপ টেনে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশন অব চায়না (অ্যাভিক, ষষ্ঠ), চায়না ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি গ্রুপ করপোরেশন (সিইটিসি, অষ্টম) এবং চায়না নর্থ ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপ করপোরেশন (নোরিনকো, নবম)। চীনের অন্য কোম্পানির নাম চায়না সাউথ ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপ করপোরেশন (সিএসজিসি, ২৪তম)।

সিপ্রির জ্যেষ্ঠ গবেষক ন্যান তিয়ান বলেন, চীন পিপলস লিবারেশন আর্মির জন্য সামরিক আধুনিকায়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ফলে সেই দেশের অস্ত্র কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে।

প্রথম পঁচিশে বিশ্বের অন্যতম সামরিক শক্তি রাশিয়ার কোম্পানি মাত্র দুটি—আলম্যাজ-অ্যানটে ও ইউনাইটেড শিপ বিল্ডিং। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে কোম্পানি দুটির বিক্রি কমেছে ৬৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আরেক রুশ কোম্পানি ইউনাইটেড এয়ারক্র্যাফটের বিক্রি আগের বছরের তুলনায় ১৩০ কোটি ডলার কমেছে। ফলে কোম্পানিটি শীর্ষ ২৫ থেকে ছিটকে পড়ে।

সিপ্রির গবেষক আলেক্সান্ডার কুইমোভা বলেন, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা এবং নৌবহর আধুনিকায়নে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ কমে যাওয়ায় ইউনাইটেড শিপ বিল্ডিং ২০১৯ সালে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

## শীর্ষ পঁচিশের বেচাবিক্রির রকমফের

দেশ বিবেচনায় শীর্ষ ২৫ কোম্পানির সম্মিলিত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির মধ্যে চীনের হিস্যা হলো ১৬ শতাংশ। পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের অংশ হচ্ছে ১৮ শতাংশ। রুশ কোম্পানি দুটোর হিস্যা ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ২৫ কোম্পানির মধ্যে ১৯টির বিক্রি বেড়েছে। এর মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫১০ কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের লকহিড মার্টিন, যা টপ ২৫ কোম্পানির মোট বিক্রির ১১ শতাংশ।

---

কেমন চলছে

## ৯ মাস ধরে ঘরে বসেই ব্যবসা পরিচালনা করছি





লেখা সৈয়দ নুরুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ওয়েল গ্রুপ অব কোম্পানিজ

করোনার ধাক্কা সামাল দিতে মার্চে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে আমিও ঢাকা ছেড়ে আমার গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। চট্টগ্রামের মোহরায় গ্রামের বাড়িতে বসেই ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বিস্তৃত ব্যবসা পরিচালনা করেছি। এখনো এভাবেই চলছে। কারখানা বা কার্যালয়ে না গিয়েও যে কারখানা ও ব্যবসা পরিচালনা করা যায়, সেটি এ করোনাকাল আমাদের শিখিয়েছে। আমি মনে করি, এতে সময়ের অপচয় কমেছে। আমি দেখেছি, স্বাভাবিক সময়ে আমাদের গাজীপুরের কারখানায় যাওয়া-আসাতেই আমার চার ঘণ্টার বেশি সময় রাস্তায় কেটে যেত। এখন সেই ঝামেলা নেই। প্রতিদিন নিয়ম করে অনলাইনে সভা করছি। সবার সঙ্গে কথা বলছি। দিকনির্দেশনা দিচ্ছি। ব্যবসা পরিচালনায় কোথাও কোনো অসুবিধা বোধ করছি না। আমি মনে করি, আমাদের উদ্যোক্তারা অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনার এ ব্যবস্থা আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবেন।

তবে করোনার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় ধরনের বিপর্যয়ের পরও কোনো খাতেই সে ধরনের কোনো অসন্তোষ বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। এটি আমাদের সবার জন্য মঙ্গলজনক। আমাদের সবচেয়ে বেশি শ্রমঘন শিল্প খাত পোশাক। করোনার একেবারে প্রথম পর্যায়ে এ খাতের জন্য সরকার বিশেষ তহবিলের ঘোষণা দেয়। শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্যই মূলত এ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। সরকারের সেই উদ্যোগ পুরো পোশাকশিল্প খাতকে বড় ধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

করোনার কারণে সার্বিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ব্যবসা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসার পরও তা কাটিয়ে উঠতে কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। ব্যবসায়ীরা যাতে দ্রুত ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারেন, এ জন্য সরকারের প্রণোদনা সুবিধা ও ব্যাংকঋণ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সময় দিতে হবে। এ মুহূর্তে ব্যবসায়ীদের ওপর যদি ব্যাংকঋণ ফেরত দেওয়ার চাপ তৈরি হয়, তাহলে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে।

তৈরি পোশাক ছাড়াও খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা রয়েছে। পোশাকের ব্যবসা গত কয়েক মাসে কিছুটা ভালো হলেও গত মাস থেকে আবার কিছুটা খারাপ হতে শুরু করেছে। এ ছাড়া নিজেদের খাদ্যপণ্যের ব্যবসার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, এ খাতের ব্যবসার ৪০ শতাংশও এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি। ব্যবসার অবস্থা খারাপ হলেও আমরা আমাদের কোনো শ্রমিকের বেতন দিতে দেরি করিনি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুতও করিনি। বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। পোশাক, বস্ত্র, খাদ্যপণ্য, সেবা খাতসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসা রয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি খুব ছোট পর্যায়ে থেকে আজকের অবস্থানে এসেছে। সমাজে আজ আমাদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে, তা ব্যবসার সুবাদে। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম, যতক্ষণ সামর্থ্য আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা দিয়ে যাব। প্রয়োজনে নিজেরা ঋণ করে, ধারদেনা করে হলেও এ কাজ করব। তবে সরকার এগিয়ে আসায় আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।

করোনার কারণে শুরুতে কয়েক মাস শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক কাজ করলেও সময়ের ব্যবধানে তা কেটে যায়। শ্রমিকেরা কাজে ফিরে আসেন। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে ঠিকই কিন্তু অর্থনীতির ঝুঁকি অনেক কমে গেছে। পাশাপাশি আমরা দেখেছি, গ্রামগঞ্জের হাটবাজার এ করোনাকালেও বেশ সচল ছিল। এর ফলে গ্রামগঞ্জে চাহিদার খুব বেশি তারতম্য হয়নি। এটিই আমাদের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি বড় শক্তির দিক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। তবে আমি মনে করি, গত কয়েক মাসে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমরা আগামী দিনগুলোর চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

